শ্রেণি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি-২

অর্থনীতির গতি : জাতীয় আয়ে শ্রমজীবী মানুষের অংশীদারত্ব

আনু মুহাম্মদ

দেশের ভেতরে সমাজ ও অর্থনীতির গতিশীলতা, প্রযুক্তি, নীতি এবং বহিস্থ নানা প্রভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবস্থানের আনুপাতিক পরিবর্তন হতে থাকে। তার সাথে সাথে সমাজে কর্মসংস্থান, শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। পেশা, আয়, কর্মসময়, বাজারের সাথে যুক্ততা, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক শ্রমবিভাজন–অনেক কিছুই তাতে প্রভাবিত হয়। এর বিস্তৃত অনুসন্ধানে শ্রেণিক্ষমতা, রাষ্ট্র, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদির স্বরূপও ধরা পড়ে। 'শ্রেণী, রাষ্ট্র ও রাজনীতি' শীর্ষক ধারাবাহিক লেখার দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন খাতের এই আনুপাতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে পেশাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় আয়ে গ্রাম শহরের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আনুপাতিক আয়ের গতিমুখ কী তা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময়ের বিভিন্ন খাতওয়ারি বিশ্লেষণ থেকে এটা এখন স্পষ্ট করেই বলা যায় যে বাংলাদেশের অর্থনীতি আর কোনোভাবেই কৃষিপ্রধান নেই। স্বাধীনতার পর কৃষিই ছিল জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ তখন গঠিত হতো কৃষি থেকে। কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতেই তৈরি হতো। গত চার দশকে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে ব্যাপক মাত্রায়, গ্রামীণ অর্থনীতিতে অকৃষি তৎপরতাও বেড়েছে অভূতপূর্ব হারে। অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির বাজারমুখী তৎপরতা, উৎপাদন– সবই বেড়েছে, তবে মোট জাতীয় আয়ে তার অনুপাত কমে গেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। সরকারের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, জাতীয় আয়ে কৃষির অংশ এখন শতকরা মাত্র ১৫.৬ ভাগ। শস্য ও সবজি আলাদাভাবে হিসাব করলে তার অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৯ ভাগ, এছাড়া মৎস্যসম্পদের অনুপাত বেড়েছে, তা এখন জিডিপির শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। বাকি প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ। গ্রামাঞ্চলে শস্যচাষের বাইরে মুরগির খামার, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র পরিবহন, দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক তৎপরতা বেড়েছে।

অন্যদিকে সরকারি হিসাবে শিল্পের অনুপাত দেখা যাচ্ছে কৃষির তুলনায় বেশ বেশি, শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ। শিল্প (industry) বলতে এখানে নির্মাণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু কারখানা (manufacturing) ধরলে জাতীয় আয়ে তার অনুপাত শতকরা প্রায় ২০ ভাগ, অর্থাৎ কৃষি খাতের চেয়ে বেশি। শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে উপস্থাপিত নির্মাণ খাতের অনুপাত ভিন্নভাবে হিসাব করলে তা দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৮ ভাগ, যা কৃষির শস্য উপখাতের কাছাকাছি। বিশেষ করে গত প্রায় তিন দশকে নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বরাবরই বেশি ছিল। সারাদেশে ভবনসহ নির্মাণকাজে এই প্রবৃদ্ধি নির্মাণ শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে। কৃষি ও (নির্মাণসহ) শিল্প খাত বাদ দিলে বাকি পুরোটাই পরিষেবা খাত (service sector)। শপিং মল, প্রাইভেট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইত্যাদি এই পরিষেবা বা সার্ভিস তৎপরতার মধ্যে পড়ে। এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হলো সব ধরনের বস্তু ও অবস্তু কেনাবেচা, যেমন–পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, বাণিজ্যিক শিক্ষা ও চিকিৎসা, ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, ভাড়া ইত্যাদি। এসব তৎপরতা এখন জিডিপির শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ বা মোট অর্থনীতির অর্ধেকেরও বেশি (সরকার, ২০১৫)।

কোনটি কত বাড়ল?

আগের পর্বে দেখিয়েছি যে খাদ্যসহ কৃষি ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প খাতে গড় উৎপাদন বা সূচকও বেড়েছে। পুরো অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে বহুগুণ। জিডিপি বা জাতীয় আয় দিয়ে পরিমাপ করলে

বিভিন্ন বছরে অর্থনীতির চিত্র

	১৯৭২-৭৩	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৪-৯৫	২০০৪-০৫	২০০৮-০৯	২০১৪-১৫
জিডিপি (চলতি দামে, কোটি টাকায়)	৪,৯৮৫	৫৬,১৯৪	১,৫২,৫১৭	৩,৩২,৯৭৩	৬,১৪,৭৯৫	১৫,১৩,৬০০
মাথাপিছু বার্ষিক আয় (টাকায়)	৭২৫	৬,২৪৩.৭৮	১২,৭২০	২৭,০৬১	৪২,৬২৮	১,০২,০২৬
মজুরি সূচক (টাকায়)	১০০ (১৯৬৯-৭০)					৮,০৫৭
কৃষি (জিডিপির %)	৪৯.৫৭	৩২.০১	২৫.৩৩	২০.১৮	১৬.২৫	১৫.৯৬
শিল্প, নির্মাণসহ (%)	১২.২৯	১৯.৪২	২১.০৮	২৩.৭০	২৬.১৮	২৭.৩৪
পরিষেবা (%)	৩৮.১৪	৪৮.৫৭	৫৩.৫৯	৫৬.১২	৫৭.৫৭	৫৬.৭০

সূত্র : বিবিএস, ২০১৬। সরকার, ২০০২, ২০১১, ২০১১খ, ২০১৫। মুহাম্মদ, ২০০০, ২০১১।

চলতি দামে ১৯৭২-৭৩ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, আর ২০১৫ নাগাদ এর পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি দামে অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে প্রায় ৩০০ গুণ। মুদ্রাস্ফীতি হিসাব করলে অবশ্য এটা কমে আসবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চলতি দামে ২০১০-১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি হলো ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৯৫-৯৬ স্থির দামস্তরে হিসাব করলে এর পরিমাণ হয় ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে ২০১৫ সালের মোট জিডিপি দাঁড়ায় ৮ লাখ কোটি টাকার কিছু বেশি। ডলারের বিনিময় হার হিসাব করলে ১৯৭২-৭৩ সময়কালে মোট জিডিপি ছিল ৭.১৫ বিলিয়ন ডলার, ২০১৫ সালে তার পরিমাণ ১৭৩ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ মার্কিন ডলারের হিসাবে বেড়েছে ২৪ গুণ। সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ১১৬ মার্কিন ডলার, ২০১৫ সালে সরকারের দাবি অনুযায়ী তা ১৪০০ ডলার ছাড়িয়েছে (৫ এপ্রিল ২০১৬, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য), অর্থাৎ বেড়েছে ১২ গুণ। চলতি বাজারদরে টাকার অঙ্কে অবশ্য এই বৃদ্ধি প্রায় ১৪০ গুণ।

যেভাবেই হিসাব করি না কেন, অর্থনীতির এই বিস্তার উল্লেখযোগ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে অর্থনীতি সম্প্রসারিত হচ্ছে, সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে বর্ধিত আকারে। এতে গ্রাম-শহরের শ্রমিক ও শ্রমজীবী নারী-পুরুষের অবদানই প্রধান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের প্রাপ্ত মজুরির প্রকৃত চেহারা কী? বর্ধিত সম্পদে তাদের ভাগ বাড়ল না কমল? সরকারের দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিষয়ক পরিসংখ্যানে যেভাবে এই চিত্র উপস্থিত করা হয় তাতে আড়াল হয় অনেক কিছুই, তাই বিষয়টি পরিষ্কার হয় না।

মজুরি বৃদ্ধির ধরন : নানা হিসাব

মুদ্রায় ও প্রকৃত মজুরির পরিবর্তন বিষয়ে সরকারি তথ্য থেকে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়ার কথা। সকল তথ্যের মূল সূত্র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস। সরকারি পরিসংখ্যান এ রকম দাবি করতে চায় যে ৪৫ বছর আগের তুলনায় কৃষি-শিল্পসহ সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বর্ণনা অনুযায়ী, ১৯৬৯-৭০ সালে মজুরি সূচক ১০০ ধরে ২০১৫ সালে নামিক বা টাকার অঙ্কে মজুরি সূচক দাঁড়ায় ৮০৯৭, টাকার অঙ্কে বেড়েছে প্রায় ৮০ গুণ (সরকার, ২০১৫)। তবে আগেই উল্লেখ করেছি যে একই সময়ে চলতি দামস্তরে জিডিপি বেড়েছে প্রায় ৩০০ গুণ। যা হোক, বিবিএসের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে ১৯৬৯-৭০ সালে তারা কত মজুরি ধরেছে তার উল্লেখ নেই। তবে ২০১৫ সালে তারা শ্রমিকদের সাধারণ ও উপখাত ধরে মজুরির বর্ণনা দিয়েছে। সরকারি দলিলে দেশের শ্রমিকদের গড় মজুরি ধরা হয়েছে মাসিক ৫৫৬২ টাকা, এর মধ্যে কৃষি শ্রমিকদের গড় মজুরি ৪৯৮৫ টাকা, মৎস্য খাতের শ্রমিকদের ৪৮২১ টাকা, শিল্প খাতের শ্রমিকদের গড় মজুরি ধরা হয়েছে মাসিক ৬৬২০ টাকা আর নির্মাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মাসিক আয় ৪৭৫৬ টাকা। গড় এই মজুরি সঠিক তথ্যের কাছাকাছি হতে পারে, যদি সকল শ্রমিকের মজুরি পরিশোধিত হয়, তাদের ১২ মাস কাজ থাকে এবং ১২ মাস কাজ করার ক্ষমতা থাকে।

বোঝা যাচ্ছে, ১৯৬৯-৭০ কিংবা তার পরবর্তী কয়েক বছরে মজুরি মাসিক ১০০ টাকার বেশ কম ধরা হয়েছে। এর সাথে তুলনার মানদণ্ডও এখানে পরিষ্কার নয়। তাছাড়া এই গড় হিসাবে মৌসুমের চাহিদাসহ নানা পার্থক্য আড়াল করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে কোনো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। শ্রমিকদের মধ্যে খাতওয়ারি কিছু ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে, সব প্রতিষ্ঠানে তা কার্যকর হয়নি। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অনুপস্থিতি, চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি থাকা এবং অসংগঠিত খাতের প্রাধান্যের কারণে মজুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই একটি নিম্নমুখী ঝোঁক আছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যারা শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান করে, সেখানে কোনো মজুরিবিধি নেই, সরকারেরও সে ক্ষেত্রে কোনো দায়দায়িত্ব বা ভূমিকা দেখা যায় না। শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য, যাদের অনেক ক্ষেত্রে কোনো মজুরিই থাকে না, থাকলেও খুবই কম।

পরিসংখ্যানের ধরন থেকে এটা ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠান মজুরির পরিবর্তন হিসাব করতে গিয়ে আগের প্রান্তের মজুরির কম দিকটা ধরেছে এবং বর্তমান (সব বছরেই) সময়টার মজুরির ঊর্ধ্বসীমা ধরেছে। এর ফলে প্রকৃত মজুরির যে বৃদ্ধি দেখা যায়, তা স্বল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মজুরি চিত্র ছাড়া বাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ নয়। এছাড়া সরকারি পরিসংখ্যানে অন্য বড় ঘাটতি হলো কর্মঘণ্টা বিবেচনায় না নেওয়া। একজন মানুষ যদি কর্মঘণ্টা বৃদ্ধির মাধ্যমে তার মজুরি বৃদ্ধি করে, সেই বর্ধিত মজুরিকে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি হিসেবে অভিহিত করা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। কেননা প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজ করে বাঁচার মতো মজুরি পাওয়ার কথা। অথচ বাংলাদেশে অসংখ্য মানুষ তা না পেয়ে কর্মসময় বৃদ্ধির মাধ্যমেই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করছে। অর্থাৎ তারা একাধিক কাজ, বর্ধিত শ্রমসময় কিংবা বাড়তি আয়ের নানা রাস্তা খোঁজার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। সেজন্য ঘণ্টাপ্রতি মজুরি হিসাব করা সঠিক চিত্র পাওয়ার একটা পথ হতে পারত। বিবিএস সে রকম কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অনুপস্থিতি, চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি থাকা এবং অসংগঠিত খাতের প্রাধান্যের কারণে মজুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই একটি নিম্নমুখী ঝোঁক আছে।

সরকারি পরিসংখ্যানসৃষ্ট এই বিভ্রান্তি বা সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অন্য কিছু পদ্ধতিতেও আমরা প্রকৃত মজুরির হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে পারি। ১৯৬৯-৭০ বা ১৯৭২-৭৩ এর সাথে বর্তমান মজুরি তুলনার জন্য গ্রহণযোগ্য পথ হলো, সেই সময়ের প্রাপ্ত মজুরির সঙ্গে সেই সময়ের দামস্তরে বর্তমান মজুরির তুলনা। অথবা প্রাপ্ত মজুরির ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ নির্দিষ্ট মজুরি দিয়ে বাছাই করা কিছু দ্রব্যসামগ্রী কতটা ক্রয় করা যায় তার একটি তুলনামূলক আলোচনা। এই হিসাব বিবিএস করেনি। যেহেতু চাল বাংলাদেশের মানুষের জন্য সব সময়ই প্রধান খাদ্যদ্রব্য, এবং যেহেতু শ্রমিকদের মজুরির প্রধান অংশ এই চাল কিনতেই ব্যয় হয়, সেহেতু চালের দাম দিয়ে তুলনা করা একটি পথ। তবে চালের দাম খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় এর দাম কৃত্রিমভাবে উৎপাদন খরচের তুলনায় কমিয়ে রাখায় তা দিয়েও

তুলনা যথার্থ হয় না। কেননা তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দাম অনেক বেড়েছে। যেমন স্বর্ণের দাম বিভিন্ন কারণে দুই সময়কালের মধ্যে বেড়েছে অনেক, ৩০০ গুণেরও বেশি।

ষাটের দশকে শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের কথা আগেই বলেছি। সেই আন্দোলনের একটি ফল ছিল ন্যূনতম মজুরির জন্য নূর খান কমিশন গঠন। এই কমিশন ১৯৬৯ সালে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছিল ১২৫ টাকা, অন্যান্য সুবিধাসহ মোট মজুরি ধরা হয়েছিল ১৫৫ টাকা। আন্দোলনের মুখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নও হয়েছিল। এর সাথে তুলনা করতে যেসব উপখাতে ন্যূনতম মজুরির আইনি বিধান আছে, তার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প বাছাই করাই যুক্তিযুক্ত। কেননা মোট শিল্প শ্রমিকদের এক বৃহৎ অংশ প্রকৃতপক্ষে গার্মেন্টসের শ্রমিক। তাছাড়া অন্যান্য উপখাতের তুলনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরিও বেশি। এই শিল্প উপখাতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্দোলন তো বটেই, এমনকি বকেয়া মজুরি, ওভারটাইম পরিশোধ, বেআইনি ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন–এগুলো সব সময়ই চলছে। গুম, অপহরণ, নির্যাতন, অবহেলায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু, যৌন নিপীড়ন–এসবও নানাভাবে জারি আছে। তাজরীনে আগুনে পুড়ে শতাধিক শ্রমিক ছাই হলো, রানা প্লাজায় ভবন ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার ভয়ংকর ঘটনা এই শিল্পের একদিকে দ্রুত বিস্তার, অন্যদিকে এর বিশালসংখ্যক শ্রমিকের অরক্ষিত অবস্থাই নির্দেশ করে।

যা হোক, ১৯৬৯-৭০ সালে শ্রমিকদের ভোক্তা ব্যয় সূচক ১০০ ধরলে বর্তমানে দামস্তরের পরিবর্তন বিবেচনায় সে সময়ের ন্যূনতম মজুরি ১২৫ টাকা বর্তমান বাজারদরে হয় কমপক্ষে ১২ হাজার টাকা। কিন্তু অনেক আন্দোলনের পরও গার্মেন্টসে ন্যূনতম মজুরি সর্বশেষ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৩০০ টাকা। এর পরও অনেক কারখানা এখনো আছে, যেখানে এই ন্যূনতম মজুরিও কার্যকর হয়নি। আমরা ধরে নিই যে সকল কারখানায় এই ন্যূনতম মজুরি চালু হয়েছে এবং তার সঙ্গে আমরা যদি ১৯৬৯-৭০ এ ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি সেই সময়ের, এমনকি ১৯৭২-৭৩ এর দামস্তর দিয়ে তুলনা করি তাহলে ৪৫ বছরে প্রকৃত মজুরি কত দাঁড়িয়েছে তা জানা যাবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভোক্তা মূল্যসূচক দরকার হবে। সেভাবে হিসাব করে দেখা যায় যে ৪৫ বছর আগে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি যদি হয় ১২৫ টাকা, এখন প্রাপ্ত মজুরির প্রকৃত মূল্য তার শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশি।

তবে চালের হিসাবে ভিন্ন চিত্র আসে। সে সময়ের ন্যূনতম মজুরি ১২৫ টাকায় মাঝারি চাল কেনা যেত চার মণ, ১৯৭২-৭৩ এ ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ১৫৫ টাকা দিয়েও চাল কেনা যেত চার মণ। গত কয়েক বছরে চালের দাম নানা ব্যবস্থায় কমিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমানে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকায় সাধারণ মানের চাল কেনা যায় চার মণের কিছু বেশি। অর্থাৎ চালের দাম হিসাব করলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি না বাড়লেও কমেনি। অবশ্য পরিবহন, বাসাভাড়াসহ অন্যান্য পণ্যের দাম বিচার করলে প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশি হবে। আবার শুধু স্বর্ণের দামে তুলনা করলে প্রকৃত মজুরি হয়ে গেছে শতকরা ২০ ভাগেরও কম। অন্যদিকে বিদ্যমান বাজারদর অনুযায়ী হিসাব করলে সরকারের দারিদ্র্যসীমার আয় হিসাব করলে চার সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক আয় হতে হয় কমপক্ষে ১৬ হাজার টাকা। তার মানে গার্মেন্টস শিল্পে ন্যূনতম মোট মজুরি কোনোভাবেই দারিদ্র্যসীমার আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি হয় না।

চালের দাম খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় এর দাম কৃত্রিমভাবে উৎপাদন খরচের তুলনায় কমিয়ে রাখায় তা দিয়েও তুলনা যথার্থ হয় না। কেননা তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দাম অনেক বেড়েছে। যেমন স্বর্ণের দাম বিভিন্ন কারণে দুই সময়কালের মধ্যে বেড়েছে অনেক, ৩০০ গুণেরও বেশি।

তবে প্রবাসী আয় বেশ বড়সংখ্যক শ্রমজীবী পরিবারের জীবনযাত্রার মান, গ্রামীণ অর্থনীতির গতিময়তা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা বড় বিপর্যয়ে পতিত হননি তাঁদের গড় আয় সমগোত্রীয় অন্যদের দেশে অর্জিত গড় আয়ের চেয়ে বেশি। এছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয় ও স্বকর্মসংস্থানে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণেরও ভূমিকা আছে।

জাতীয় আয়ে অংশীদারিত্ব

অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিকদের অবস্থান শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জাতীয় আয়ে তাঁদের অংশীদারিত্ব বাড়ল না কমল সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে অর্থনীতির বিকাশের গতিমুখ চিহ্নিত করা সম্ভব। তিন দশক আগে ডা. সইফ উদ দাহার এই অংশীদারিত্বের অনুপাত হিসাব করে দেখিয়েছিলেন। বিশ্লেষণ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, স্বাধীনতার পর জাতীয় আয়ে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে। তাঁর হিসাব ছিল ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত। তিনি হিসাব করেছিলেন এভাবে :

১৯৬৯-৭০ সালে কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক আয় ছিল গড়পড়তা ৩ টাকা। ৮ মাস কাজ ধরে একজনের বার্ষিক আয় ছিল ৭২০ টাকা। এক কোটি কৃষি শ্রমিকের বার্ষিক আয় ছিল ৭২০ কোটি টাকা। ৫০ লাখ শিল্প-অশিল্প শ্রমিকের (মাসিক আয় গড়পড়তা ১২০ টাকা ধরে) বার্ষিক আয় ছিল ৭২০ কোটি টাকা। তাহলে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষের মোট আয় ছিল তখন সর্বোচ্চ বার্ষিক ১৪৪০ কোটি টাকা। সে সময় জিডিপি ছিল ৩৫৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের (পরিবারের সদস্যসহ শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ) অংশ ছিল শতকরা ৪০ ভাগ (মুহাম্মদ, ১৯৯২)।

একই হিসাব অনুসরণ করে ১৯৮৭-৮৮ সালে শ্রমিক-মজুরদের সম্মিলিত আয় পাওয়া যায় ১২ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। এই সময়ে জিডিপি ছিল ৪৩৯২৬ কোটি টাকা। সে সময় তাদের অংশীদারত্ব দাঁড়ায় শতকরা ২৯ ভাগ। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে (২০১৬) এই হিসাবটি আমি আরো বিস্তৃতভাবে করেছি। এই বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে বিভিন্ন খাত ও উপখাতে কর্মসংস্থানের চিত্রটি দেখা দরকার।

গত ৪৫ বছরে শিল্প ও অশিল্প খাতে শ্রমিকসংখ্যা বেড়েছে। অর্থনীতির অনুপাতে কৃষি শতকরা ১৫ ভাগ হলেও কর্মসংস্থানে কৃষির অনুপাত এখনো সর্বোচ্চ। তবে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সমস্যা

আছে। ধারাবাহিকতার অভাব আছে, বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা আছে। আমি এখানে সর্বশেষ সরকারি দলিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (জুন ২০১৫), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (ডিসেম্বর ২০১৫), রিপোর্ট অন ইকোনমিক সেন্সাস ২০১৩ (ডিসেম্বর ২০১৫) এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুক ২০১৪ (১৩ জানুয়ারি ২০১৬) পর্যালোচনা করে তথ্য-উপাত্ত জড়ো করেছি। বলে রাখা ভালো যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে এগুলো প্রকাশিত হলেও কোথাও কোথাও তা অসমাপ্ত, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ ইত্যাদির ফলে স্বচ্ছ ও হালনাগাদ তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যা হোক, এগুলো বিবেচনায় রেখেই আমি হিসাব করছি।

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি হিসাব করা হয় ৫ কোটি ৩৭ লাখ। এদের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ কৃষিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। কারখানা শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত আছে ৭২ লাখ। পরিবহন খাতের সঙ্গে যুক্ত আছে প্রায় ৪৫ লাখ। নির্মাণশ্রমে আছে ২১ লাখ। ছোটবড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় ছোট বিক্রেতা হিসেবে আছে ৮২ লাখ। জরিপ অনুযায়ী এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বা ২ কোটি ১০ লাখই স্বকর্মে নিয়োজিত, মানে তাদের কোনো নিয়োগকারী নেই। ইনফরমাল সেক্টর বলে পরিচিত হকার ছোট দোকান বা টং দোকান ইত্যাদি নিয়ে জীবিকা অর্জন করছে। দিনমজুর হিসেবে কাজ করে প্রায় এক কোটি, বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল অনুযায়ী, শতকরা হিসাবে মোট কর্মসংস্থানের ৪৭.৩০ ভাগ কৃষি, মৎস্য ও বনজ সম্পর্কিত শ্রমে নিয়োজিত। এরপর আছে হোটেল-রেস্তোরাঁ শ্রমিক শতকরা ১৫.৫৩ ভাগ, এরপর কারখানা শ্রমিক শতকরা ১২.৩৪ ভাগ, পরিবহন শ্রমিক শতকরা ৭.৩৯ ভাগ এবং নির্মাণ শ্রমিক ৪.৭৯ ভাগ।

বাংলাদেশের কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত শ্রমিকের সংখ্যা মোট প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ। তাদের মাথাপিছু দৈনিক গড় আয় ২০০ টাকা, মাসে ২৫ দিন এবং ৮ মাস কাজ ধরে বার্ষিক মাথাপিছু মোট আয় হয় ৪০ হাজার টাকা। এই হিসাবে কৃষি সম্পর্কিত শ্রমিকদের মোট বার্ষিক আয় এক লাখ কোটি টাকা। অন্যদিকে সরকারি হিসাবে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ৭২ লাখ, এর সঙ্গে পরিবহন, দোকান, রেস্তোরাঁসহ স্বকর্মসংস্থান ইত্যাদি মিলিয়ে মোট শ্রমিকসংখ্যা ৩ কোটি। গড় মাসিক আয় ৬০০০ টাকা এবং কর্মসময় বছরে ১১ মাস বিবেচনা করলে তাদের মোট বার্ষিক মাথাপিছু আয় হয় ৬৬ হাজার কোটি টাকা। তাদের সম্মিলিত বার্ষিক আয় ১ লাখ ৯৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষ শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে এখন আয় করে বছরে ২ লাখ ৯৮ হাজার কোটি টাকা। টাকার অঙ্কে এখন জিডিপির পরিমাণ ১৫ লাখ কোটি টাকা। বর্তমান জিডিপির সাথে অনুপাত করলে এর শতকরা হার ১৯.৮৭ ভাগ। এই হিসাব এটা স্পষ্ট করে যে স্বাধীনতার পর গত ৪৫ বছরে দেশের অর্থনীতির বিস্তার ঘটেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়, রোজগারি কাজে যুক্ততা বেড়েছে, লেনদেনের অর্থনীতি সম্প্রসারিত হয়েছে প্রায় সকল দিকে। কৃষি-শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন সম্পদ যোগ হয়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু এই সম্পদ বিস্তারের ওপর অধিকার কেন্দ্রীভূত হয়েছে, বিকাশের ধরনের কারণেই, সমাজে উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শ্রেণির হাতে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ, দেশের অর্থনীতি বিস্তারে যারা মূল ভূমিকা পালন করেছে, এই বর্ধিত সম্পদে তাদের প্রাপ্তির অনুপাত ক্রমাগত কমেছে। স্বাধীনতাকালে এই অংশীদারত্ব ছিল জিডিপির শতকরা ৪০ ভাগ, এখন তা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০ ভাগেরও কমে। দুই বছর আগে এই হিসাব পেয়েছিলাম শতকরা ২৪ ভাগ।

অর্থনীতির সমৃদ্ধির পেছনে কৃষি শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিকদের কৃতিত্বই বেশি। অথচ এই প্রবৃদ্ধির অংশীদারত্বে অবস্থানের ক্রমাবনতি তাদের রাজনৈতিক আপেক্ষিক শক্তির দুর্বলতাপ্রাপ্তিকেই নির্দেশ করে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেশে জিডিপিসহ অর্থনীতির বৃদ্ধির উচ্চহারের সাথে প্রকৃত প্রাপ্তির নিম্নমুখী প্রবণতা কোনোভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়। এর রহস্য অনুধাবন করতে গেলে রাষ্ট্র ও শ্রেণিক্ষমতার দিকে তাকাতে হবে।

প্রশ্ন হলো, এই ক্রমবর্ধিত সম্পদ কোথায় কিভাবে কাদের কাছে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে? এর সাথে আরো প্রশ্ন আসে, পণ্যের সম্প্রসারিত বাজার কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? সরকারি দারিদ্র্য বিষয়ক পরিসংখ্যানে দারিদ্র্য হ্রাসের যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আমরা বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির বিকাশের ধরন ও তার রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে পারব। পাশাপাশি মধ্যবিত্তের বিস্তারের ব্যাখ্যাও সেখান থেকে পাওয়া যাবে। এসব বিষয়ে পরবর্তী পর্বে আলোচনা থাকবে।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র

বিবিএস, ২০১৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো : Statistical Yearbook 2014, January.

মুহাম্মদ, ১৯৯২। আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের কোটিপতি মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক, চলন্তিকা।

মুহাম্মদ, ২০০০। আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, শ্রাবণ।

মুহাম্মদ, ২০১১। আনু মুহাম্মদ : সামরিক শাসনের দশকে, নবরাগ প্রকাশনী।

সরকার, ২০০২। বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন।

সরকার, ২০১১। বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন।

সরকার, ২০১৫। বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন।

সরকার, ২০১৫খ। বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় : Report on Economic Census, December 2013.

সরকার, ২০১১খ। বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় : 6th Five Year Plan FY 2011-FY2015, 22 June.

সরকার, ২০১৫গ। বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় :